রবীন্দ্রনাথের গানে যন্ত্রানুষঙ্গ : একটি ধারাবাহিক সমীক্ষা

Dr. Jhinuk Talapatra

Abstract:

রবীন্দ্রসঙ্গীতের পরিবেশনায় যন্ত্রানুষঙ্গ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা গানটির ভাবপ্রকাশ, নান্দনিকতা এবং সাংগীতিক আবহ নির্মাণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। বর্তমান প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানের সূচনালগ্ন থেকে শান্তিনিকেতন ও সংগীত ভবনের বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যবহৃত যন্ত্রানুষঙ্গের ধারাবাহিক বিবর্তন বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণায় দেখা যায় যে, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সংগীতচর্চার পরিবেশে রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে প্রথমদিকে হারমোনিয়াম, পিয়ানো, অর্গ্যান, বেহালা প্রভৃতি যন্ত্র ব্যবহৃত হলেও পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর এস্রাজ ধীরে ধীরে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রধান সহযোগী যন্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

প্রবন্ধে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাচাওয়ান মিশ্র, অশেষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শৈলজারঞ্জন মজুমদার প্রমুখের অবদানের মাধ্যমে রবীন্দ্রসঙ্গীতে এস্রাজের বিশেষ গুরুত্ব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। একই সঙ্গে সংগীত ভবনের শিক্ষাপদ্ধতিতে যন্ত্রব্যবহারের পরিবর্তন, হারমোনিয়ামের পুনঃপ্রবর্তন এবং আধুনিক সময়ে তানপুরা, কী-বোর্ড, সেতার, বাঁশি ও অন্যান্য যন্ত্রের সীমিত ও পরিমিত ব্যবহারের দিকও আলোচিত হয়েছে।

এছাড়া প্রবন্ধে রবীন্দ্রসঙ্গীতে আবহসংগীতের (Background Music) ব্যবহার ও তার বিবর্তন সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। গবেষণার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, রবীন্দ্রনাথ কোনো নির্দিষ্ট যন্ত্র ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা আরোপ করেন নি; বরং তিনি গানকেই মুখ্য এবং যন্ত্রকে সহায়ক হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তাঁর মতে, যন্ত্রানুষঙ্গের উদ্দেশ্য গানকে আচ্ছন্ন করা নয়, বরং তার ভাব, লয় ও নান্দনিকতাকে সমর্থন করা। পরিমিতি, সংযম এবং রুচিশীল প্রয়োগই রবীন্দ্রসঙ্গীতে যন্ত্রানুষঙ্গ ব্যবহারের মূল নীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অতএব বলা যায়, রবীন্দ্রসঙ্গীতে যন্ত্রানুষঙ্গের ইতিহাস কেবল বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারগত পরিবর্তনের ইতিহাস নয়; এটি রবীন্দ্রনাথের সংগীতদর্শন, নান্দনিক চেতনা এবং সংগীতশিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক দলিল। এই গবেষণা রবীন্দ্রসঙ্গীতের পরিবেশনরীতি ও যন্ত্রব্যবহারের ঐতিহাসিক ধারাকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়নের সুযোগ করে দেয়।

Keywords:

রবীন্দ্রসঙ্গীত, যন্ত্রানুষঙ্গ, এস্রাজ, হারমোনিয়াম, শান্তিনিকেতন, সংগীতভবন, আবহসংগীত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সংগীত পরিবেশন, সংগীত নন্দনতত্ত্ব।

রবীন্দ্রসংগীত এবং যন্ত্রানুষঙ্গ – এই দুই বিষয়ের মধ্যেকার সম্পর্ক এই প্রবন্ধটির মূল প্রাণনা। রবীন্দ্রগানের সূচনালগ্ন থেকে এই গানের অনুষঙ্গ হিসেবে কোন্-কোন্ বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে এসেছে, সময়ের সাথে চলতে চলতে তাতে কোনোরকম পরিবর্তন এসেছে কি না – এসে থাকলে সেটা কিভাবে এসেছে – তার একটি ধারাবাহিক সমীক্ষা করবার প্রয়াস করা হল এই প্রবন্ধটিতে। রবীন্দ্রসংগীতে আবহসংগীতের (Background music) ভূমিকা নিয়েও এই প্রবন্ধটিতে আলোচনা করা হল। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িকে রবীন্দ্রগানের আঁতুরঘর বলা যেতে পারে। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে দ্বারকানাথ ঠাকুরের আমল থেকেই সংগীতচর্চা হয়ে এসেছে। তাঁর পুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত ধরে ঠাকুরবাড়ির অন্তর-বাহির মার্গসংগীত এবং ব্রহ্মসংগীতে পূর্ণ হয়ে ওঠে। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে হিন্দুস্থানী মার্গসংগীতের যথার্থ সমাদর ছিল। তেমন আতিথ্য ছিল পিয়ানো বা অর্গ্যানের মতন ইউরোপীয় বাদ্যযন্ত্রেরও। সেই সময়কার বিখ্যাত সংগীতজ্ঞেরা মহর্ষির আমন্ত্রণে ঠাকুরবাড়িতে সংগীত পরিবেশন করে গেছেন, অনেকে বেশ কিছুকাল অতিবাহিতও করে গেছেন। মহর্ষি রীতিমত প্রথাগতভাবেই তাঁর পুত্র-কন্যাদেরও এই সংগীতরসে সিঞ্চিত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অগ্রজ – দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর –

এঁরা প্রত্যেকেই হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গসংগীতে দক্ষ ছিলেন। এহেন সংগীতমুখর পারিপার্শ্বিকে বড় হয়ে ওঠেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। জন্মাবধি গান তাঁর রক্ত-মজ্জায় মিশে গিয়েছিলো –

" কবে যে গান গাহিতে পারিতাম না তাহা মনে পড়েনা। "[1]

বিষ্ণু চক্রবর্তী, শ্রীকন্ঠ সিংহ, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, যদুভট্ট – প্রমুখ বিদগ্ধ হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গসংগীতের তাঁর কন্ঠসংগীতের হাতেখড়ি। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং গান শিখেছেন তানপুরায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যোতিদাদা (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ) বেহালা, এস্রাজ, পিয়ানো, অর্গ্যান বাজাতে পারতেন। জ্যোতিদাদার পিয়ানোতে তোলা সুরে রবীন্দ্রনাথ কথা বসাতেন, সে ছিল তাঁর গান রচনার 'শিক্ষানবিসি'-র যুগ।[2] ঠাকুর পরিবারের প্রায় সকল সদস্যই হারমোনিয়াম বাজাতে জানতেন। ১৮৮৭ সালের মাঘোৎসবে তাঁর নবরচিত গানগুলি শোনবার জন্যে সেইসময় চুঁচুড়ায় থাকা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে আর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সেখানে ডেকে পাঠান। সেখানে রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের হারমোনিয়াম সহযোগে সেই গানগুলি মহর্ষিকে শোনান। সুতরাং, একথা সহজেই অনুমেয় যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান এবং হারমোনিয়াম সেইসময় থেকেই লগ্ন হয়ে রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের গান রচনা শুরু তাঁর তেরো-চৌদ্দ বছর বয়স থেকে। তাঁর গান প্রথমদিকে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি আর ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো। ঠাকুরবাড়ির বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায়, মাঘোৎসব – ইত্যকার নানান উপলক্ষ্যে তিনি গান রচনা করেছেন এবং সেই গানগুলি শিখিয়ে দিয়েছেন তাঁর পরিবারের সদস্যদের, ব্রাহ্মসমাজের গায়ক-গায়িকাদের।

ঠাকুরবাড়িতে তিনি পিয়ানো সহযোগে সরলা দেবী (তাঁর দিদি স্বর্নকুমারীর কন্যা), ভ্রাতুষ্পুত্রী অভিজ্ঞা দেবী, প্রতিভা দেবী, কখনো বা ইন্দিরা দেবীদের গান শিখিয়ে দিয়েছেন। আবার কখনো জ্যোতিদাদার বেহালা সঙ্গতের সাথে সারারাত নৌকাবিহারে গান গেয়েছেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের দুই-থাকের অর্গ্যান যন্ত্রের সাথে গান গেয়েছেন, গান শিখিয়েছেন ব্রাহ্মসমাজের সদস্যদের। আবার কখনো বা সেই অর্গ্যান যন্ত্রের নীচের থাকের হারমোনিয়াম বাজাচ্ছেন ইন্দিরা দেবী আর গান গাইছেন তাঁর 'রবিকা'। প্রতিভা দেবীর স্মৃতিচারণে জানা যায় যে, তাঁর যখন আট বছর বয়স, তখনকার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির 'বিদ্বজ্জন সমাগম' উৎসব সভায় গাওয়া গানের সাথে হারমোনিয়াম, বেহালা এবং তবলা সঙ্গত করা হয়েছিলো। 'সংগীতচিন্তা' গ্রন্থে একটি আলোকচিত্রে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথের গানের সাথে এস্রাজে সাহচর্য দিচ্ছেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

উত্তরকালে ১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন, তখন সেখানে আশ্রমের আদিযুগে প্রাক্-কুটিরের জানলার কাছে রাখা ছোটো টেবল্-হারমোনিয়াম সহযোগে তিনি আশ্রম বালকদের গান শিখিয়ে দিতেন। আবার পূজাবকাশের আগে তাঁর রচিত নাটকের অভিনয়ের মহড়ার বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর রয়েছেন এস্রাজে আর আশ্রমের অন্য এক শিক্ষক রয়েছেন হারমোনিয়ামে। শিকাগো যাবার পথে বোটে করে ভেসে যাওয়াকালীন রবীন্দ্রনাথ, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে একটি পত্রে লিখছেন –

" ... প্রথম বেদগানটি দালানের বেদী থেকে আমরা সকলে দাঁড়িয়ে পিতানোহসি পাঠ করব – ওটা হার্মোনিয়মের সঙ্গে বাজিয়ে করলে সুরটা ঠিক মিলবে। ছেলেদের ওটা যন্ত্রের সঙ্গে অভ্যাস করিয়ে নিস। "[3]

এই বহু-উল্লিখিত তথ্যগুলি সংশয়াতীতভাবে জানিয়ে দেয় যে, আশ্রমের আদিপর্বে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর গানের সহযোগী যন্ত্র হিসেবে হারমোনিয়ামকে গ্রহণ করেছিলেন এবং হারমোনিয়ামের ব্যবহার নিয়ে তাঁর কোনোরকম প্রতিবন্ধকতা ছিল না।

বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর উপাসনা মন্দিরে রাখা পুরানো পাইপ-অর্গ্যান সহযোগে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানের দল প্রতি বুধবার সাপ্তাহিক মন্দিরে গান গাইত।

১৯০৯ সাল নাগাদ কবি সারেঙ্গি বাদক বাচওয়ান মিশ্র সংগীত চৌধুরীকে শান্তিনিকেতন আশ্রমে নিযুক্ত করেন এবং মূলত: এই সময় থেকেই তিনি শান্তিনিকেতন আশ্রমে হারমোনিয়ামের ব্যবহার কমিয়ে দিয়ে এস্রাজ ও সারেঙ্গি ব্যবহারের ওপর জোর দেন। এরপর থেকে শান্তিনিকেতন আশ্রমে, উত্তরকালে সংগীত ভবনেও রবীন্দ্রগানের প্রধান সহযোগী যন্ত্র হিসেবে এস্রাজ পূর্ণরূপে অধিষ্ঠিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, উত্তরকালে আশ্রমের রবীন্দ্রসংগীতের অধ্যাপক শ্রী শৈলজারঞ্জন মজুমদারের কাছে রবীন্দ্রনাথ

[1] 'জীবনস্মৃতি' - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃষ্ঠা- ১

[2] 'সংগীত চিন্তা'- 'আত্মকথা : জীবনস্মৃতি', পৃষ্ঠা- ১৭৯

[3] রবীন্দ্রভবন আর্কাইভ থেকে প্রাপ্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা পত্রাংশ - (CFB - 289100000047-00000048)

ঠাকুর তাঁর গানের সহযোগী যন্ত্র হিসেবে সারেঙ্গি যন্ত্রের ব্যবহারের ইচ্ছাপ্রকাশ করেছিলেন এবং এই যন্ত্রের প্রতি শৈলজারঞ্জনের আগ্রহ দেখে গুরুদেব সুদূর মিরাট থেকে তাঁর জন্যে সারেঙ্গি আনিয়ে দিয়েছিলেন।

সংগীতশাস্ত্রের সূক্ষ্ম স্বরবিভাজনের বা স্বর থেকে স্বরান্তরে যাবার মধ্যপথের অনুতুল্য পরিমাপের স্বরচিহ্ন হলো শ্রুতি। ভারতীয় সংগীতে কেবল শীলিত কণ্ঠে এবং শীলিত বাদ্যযন্ত্রে এই শ্রুতি ধরা পড়ে। অবশ্যই ভারতীয় সুরযন্ত্রে; বিশেষত: ঘর্ষণ বাদ্যে (Bowing instrument), যেখানে আঙ্গুল বা ছড়ের সাহায্যে স্পষ্ট শ্রুতিনির্দেশ বা শ্রুতিভেদ সম্ভব। এই শ্রুতিনির্দেশের প্রসঙ্গে অমোঘভাবেই এস্রাজ যন্ত্রটির কথা উঠে আসে। শ্রুতিনির্ভর গায়ন ও শিক্ষণের প্রধান অবলম্বন হলো এস্রাজ। সেকালে উচ্চগ্রামের (High pitch) এস্রাজ তীব্র, সূক্ষ্ম ধ্বনি সাহচর্যে গাইয়েকে সঠিক স্বরসমর্থন দিত এবং একটি ঘর্ষণ বাদ্য হিসেবে কণ্ঠে প্রযুক্ত স্বরশ্রুতির সমান্তরাল সাহচর্যে গায়নকে সুঠাম, সহজ ও সুচারু হয়ে উঠতে সাহায্য করত।

তাঁর গানের সাথে এস্রাজ বাজানো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশেষ পছন্দ করতেন। এই যন্ত্রে সুরের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পর্দাটিও ধরা পড়ে।[4] ১৯০৮ সালে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতন আশ্রমে যোগদান করবার পর তিনিও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইচ্ছানুসারে রবীন্দ্রগানের অনুসারী যন্ত্র হিসেবে এস্রাজকে প্রতিষ্ঠিত করতে পূর্ণরূপে সচেষ্ট হন। তিনি আশ্রমের শিক্ষার্থীদের অধিকাংশ সময়েই এস্রাজ বাজিয়ে গান শেখাতেন। উত্তরপ্রদেশ ভ্রমণকালে একদা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,দিনেন্দ্রনাথের হাতে একটি এস্রাজ তুলে দিয়ে বলেছিলেন –

“ কখনও যদি বিষন্ন হোস্ এটাকে বাজাস। ”[5]

এস্রাজের সুর কবির হৃদয়ের কতোটা কাছে ছিল, সেটি তাঁর এই উক্তি থেকে সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

রবীন্দ্রসংগীতের কথা ও সুরের ‘অর্ধনারীশ্বর’ রূপটি যেন এস্রাজ বাদনের অনুপস্থী। সেই রূপ যেন এস্রাজের সংযত ছড়ের টানে আরও বেশি বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বকণ্ঠে গাওয়া কয়েকটি গানেও এস্রাজের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতন আশ্রম গড়ে তোলবার পর বিভিন্ন সময়ে বহু গুণী এস্রাজ শিল্পীকে আশ্রমে নিযুক্ত করেন। ১৯০৮ সালে আশ্রমের শিক্ষক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ২০বছর বয়সী কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে নিয়ে আসেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কণ্ঠসংগীত ও এস্রাজ বাদনে মুগ্ধ হয়ে তাঁর নতুন নাম দেন সুরেন্দ্রনাথ এবং তাঁকে আশ্রমের শিক্ষক রূপে নিয়োগ করেন। রবীন্দ্রসংগীতে এস্রাজের ভূমিকায় তাঁর অনেকটা অবদান রয়েছে।

সমসাময়িককালেই পন্ডিত শ্যামসুন্দর মিশ্রের শিষ্য এবং জামাতা শ্রী বাচাওয়ান মিশ্র সংগীত চৌধুরী রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে সারঙ্গি যন্ত্রের সঙ্গতে কবিকে মুগ্ধ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসেন এবং আশ্রমের সংগীত ও অভিনয়ে হারমোনিয়ামের ব্যবহার কমিয়ে দিয়ে এস্রাজ ও সারঙ্গির প্রয়োগ প্রচলন করেন।

পরবর্তীকালে ১৯৩৭ সালে অশেষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের নির্দেশানুসারে সংগীত ভবনের অধ্যাপকরূপে যোগ দেন। মাত্র ১৭ বছরের অশেষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের এস্রাজ বাদন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথকে বিস্মিত করে –

“ দিনু, তোমার কাছে একটি ধানীলঙ্কাকে পাঠালাম। এর বয়স কম, কিন্তু ঝাল কম নয়। ”[6]

দিনেন্দ্র-পরবর্তীকালে অশেষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সংগীতভবনের তৎকালীন অধ্যাপক শৈলজারঞ্জন মজুমদার শান্তিনিকেতন আশ্রমকে সুরের রসে সিক্ত করে রেখেছিলেন। অশেষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এস্রাজ যন্ত্রটিতে রবীন্দ্রসংগীতকে মূর্ত করে তুলতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি এস্রাজের এক নতুন উন্নত বাদনশৈলীর উদ্ভাবক। রবীন্দ্র গীতিনাট্য-নৃত্যনাট্যের আবহসংগীতের ক্ষেত্রে এস্রাজবাদনকে তিনি একটি বিশেষ মাত্রায় উন্নীত করেন।

উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথের অতি প্রিয়,অত্যন্ত কাছের মানুষ শৈলজারঞ্জন মজুমদারেরও নিত্যসঙ্গী ছিলো এস্রাজ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে বলতেন –

“ এস্রাজ ছাড়া তোমাকে মানায় না। ”[7]

---

[4] ‘ রবীন্দ্রসংগীত: কাব্য ও সুর’- কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা- ১৬৭

[5] ‘দিনেন্দ্রনাথ : জীবন ও সাধনা’ - বারিদবরণ ঘোষ, পৃষ্ঠা- ৪২

[6] ‘ শান্তিনিকেতনে সংগীতচর্চা ‘ - স্বপনকুমার ভট্টাচার্য, পৃষ্ঠা - ১০৮

[7] সুবিনয় রায়ের নেওয়া শৈলজারঞ্জন মজুমদারের সাক্ষাৎকার, ‘দেশ’- পত্রিকা, সাহিত্যসংখ্যা - ১৩৮০, পৃষ্ঠা- ৭৪

শৈলজারঞ্জন মজুমদারের স্মৃতিচর্চায় জানা যায় যে, তিনি শান্তিনিকেতন আশ্রমে এসে দেখেন এখানে হারমোনিয়ামের ব্যবহার নেই, তাই তিনিও 'জীর্ণ বস্ত্রের মত' হারমোনিয়ামকে ত্যাগ করেছিলেন।[৪] তাঁর এস্রাজ বাদনের হাতটি ছিল সুমিষ্ট। শান্তিনিকেতন আশ্রমে আসা ইস্তক তিনি এস্রাজ বাজিয়েই রবীন্দ্রসংগীত গেয়েছেন এবং ছাত্র-ছাত্রীদেরও শিখিয়ে গেছেন। রবীন্দ্রসংগীতে এস্রাজের প্রয়োগ অগ্রগণ্য ও অপরিহার্য – এই ছিল তাঁর দৃঢ় বক্তব্য। রবীন্দ্রসংগীতের সহায়ক যন্ত্র হিসেবে এস্রাজ থাকতেই হবে – আজীবন তিনি এই বক্তব্যে অনঢ় ছিলেন। সেই সময় (১৯৪১) সংগীত ভবনের পাঠক্রমে এস্রাজ শিক্ষা আবশ্যিক বিষয় (Compulsory subject) হিসেবে ধার্য ছিল।

অশেষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরবর্তী প্রজন্মে সংগীত ভবনে এস্রাজবাদক হিসেবে নিজের স্বতন্ত্র জায়গা করে নিয়েছিলেন তাঁর সুযোগ্য শিষ্য রণধীর রায়। তিনি সংগীত ভবনে শাস্ত্রীয়সংগীত বিভাগে এস্রাজের অধ্যাপনায় রত ছিলেন। তাঁর বাদনশৈলী এস্রাজ যন্ত্রটিকে এক অনন্য মাত্রায় উন্নীত করেছিলো। স্বল্পায়ু এই এস্রাজ শিল্পী এস্রাজ যন্ত্রকে সহযোগী যন্ত্র থেকে শাস্ত্রীয়সংগীতের স্বাধীন যন্ত্ররূপে পর্যবসিত করতে সার্থক হয়েছিলেন। এই যন্ত্রের প্রচার ও প্রসারে তাঁর কৃতিত্ব মনে রাখবার মতো। পরবর্তীকালে তাঁর শিষ্য বুদ্ধদেব দাস সংগীতভবনের অধ্যাপকরূপে এস্রাজ যন্ত্রটিকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। তিনি তাঁর অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আজও তাঁর গুরুর শিক্ষাকে কায়মনোবাক্যে সঞ্চারিত করে চলেছেন। এইভাবেই সংগীতভবনে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাঙ্খিত পথে এস্রাজ যন্ত্রের শিক্ষার ধারাটি বয়ে চলেছে।

উপরে বর্ণিত তথ্যানুসারে, শান্তিনিকেতন আশ্রমের প্রথম যুগে রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে সহযোগী যন্ত্র হিসেবে মূলত: হারমোনিয়াম এবং এস্রাজ – এই দু'টি যন্ত্রই ব্যবহৃত হত। কোনো-কোনো অনুষ্ঠানে বেহালা ব্যবহারেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে হারমোনিয়ামের ব্যবহার হ্রাস পেতে দেখা যায়। ১৯২২ সালের বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠানে এস্রাজ, বেহালা এবং বাঁশি ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৯৩২ সালে শৈলজারঞ্জন মজুমদারের শান্তিনিকেতন আশ্রমে যোগ দেবার সময় আশ্রমে হারমোনিয়ামের ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে গেছে।

এই তথ্যনিষ্ঠ ইতিহাসগুলি থেকে জানা যায় যে, রবীন্দ্র-প্রয়াণের পূর্বে সংগীত ভবন পর্বে রবীন্দ্রসংগীতের প্রধান সহযোগী যন্ত্র হিসেবে এস্রাজই মান্যতা পেয়েছে। সংগীত ভবনের সকল সংগীতাচার্য্যই এস্রাজ সহযোগে গান শেখাতেন, সঙ্গে কখনো-কখনো থাকতো তানপুরা।

রবীন্দ্র-প্রয়াণের পরবর্তী সময়ে শান্তিনিকেতন সংগীত ভবনে এস্রাজের পাশাপাশি পিয়ানো বাজিয়েও রবীন্দ্রসংগীত শেখানো হত। ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী পিয়ানো বাজিয়ে ছেলে-মেয়েদের গান শিখিয়ে দিতেন। ১৯৪৪ সালে উত্তরায়ণে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র-গীতিনাট্য 'কালমৃগয়া'-য় পিয়ানো, এস্রাজ এবং বেহালা সঙ্গতের তথ্য পাওয়া যায়। তৎপরবর্তীকালে অর্থাৎ ইন্দিরা দেবী - শৈলজারঞ্জন মজুমদার - শান্তিদেব ঘোষ - সিতাংশু রায়ের পরবর্তী প্রজন্মে সংগীত ভবনে রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষণকালে পুনরায় ধীরে-ধীরে হারমোনিয়ামের ব্যবহার শুরু হয়। আজও সংগীত ভবনে রবীন্দ্রসংগীত শেখাবার সময় অথবা যে কোনো অনুষ্ঠানে তানপুরা এবং হারমোনিয়াম – এই দু'টি যন্ত্রই বাজানো হয়ে থাকে। তানপুরার ক্ষেত্রে করচালিত (Manual) তানপুরার পাশাপাশি বেশ কয়েক বছর থেকে বৈদ্যুতিক তানপুরাও ব্যবহার করা হচ্ছে। এই ধরণের তানপুরা সময়োপযোগী, এতে স্কেল পরিবর্তন করা অনেকটাই সহজ এবং বহন করাও বেশ সহজ হওয়ায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আজকাল করচালিত তানপুরার সাথে এই তানপুরারও প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। ভবনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কী-বোর্ড, সেতার, জলতরঙ্গ, বাঁশি, কখনো বা গীটারের ব্যবহারও পরিলক্ষিত। তবে, এই সকল যন্ত্রের ব্যবহার কখনোই রবীন্দ্রনাথের গানকে ছাপিয়ে যায় না। আর এখানেই আসে পরিমিতি আর সংযমের প্রসঙ্গ – যা গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আজীবন চেয়ে এসেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান রচনার সূচনাপর্ব থেকে ২০০১ সাল অবধি শান্তিনিকেতন আশ্রমে তথা সংগীত ভবনে রবীন্দ্রগানের সহযোগী যন্ত্র হিসেবে কোন-কোন বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়েছে এবং কীভাবে সেই যন্ত্রের ব্যবহার পরিবর্তিত সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়েছে – তার একটি বিশ্লেষণাত্মক সমীক্ষা করবার প্রয়াস করা হল।

তিনি তাঁর গানের সঙ্গে কোন যন্ত্র বাজাতে হবে অথবা কোন যন্ত্র বাজানো যাবে না – সেই বিষয়েও কোনোরকম লিখিত নির্দেশ দিয়ে যান নি। তবে, বাদ্যযন্ত্র যাই হোক না কেনো, তা যেন রবীন্দ্রগানের ভাবানুযায়ী ছন্দে এবং লয়ে পরিবেশিত হয় – এই ছিল কবির মৌল অভিপ্রায়। সঙ্গতকারের নান্দনিক বোধ, পরিমিতি জ্ঞান, প্রয়োগকৌশল এবং ব্যক্তিগত প্রতিভা – এই সকল বৈশিষ্ট্যের ওপরই একটি যথাযথ পরিবেশনা নির্ভর করে। গানের ক্ষেত্রে সবচাইতে বড়ো কথা হল সুর; যন্ত্র নয়। সুরচ্যুতি যন্ত্রের 'ঝনঝনানি'

[৪] সুবিনয় রায়ের নেওয়া শৈলজারঞ্জন মজুমদারের সাক্ষাৎকার, 'দেশ'- পত্রিকা, সাহিত্যসংখ্যা - ১৩৮০, পৃষ্ঠা- ৭৪

দিয়ে ঢাকবার চেষ্টা করলে সেটি কখনোই গান হয়ে ওঠে না। বর্তমানযুগে প্রতিভার চেয়ে কৌশল বড়ো হয়ে দেখা দিচ্ছে। প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত বাদ্যযন্ত্রের উপস্থিতি মূল গানটিকেই ঢেকে দেয়; গানের অন্তর্লীন সৌন্দর্য্য বাদ্যযন্ত্রের ঝঙ্কারে প্রকাশের কোনো পথই খুঁজে পায় না। তবে, আশার কথা এই যে, আজও গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতন আশ্রমে তথা সংগীত ভবনে তাঁর প্রদর্শিত পথই অনুসৃত হয়ে চলেছে। এখানে আজও বাদ্যযন্ত্রের বাহুল্য, প্রাবল্য – গানকে আবৃত করে না, গানকে সাহচর্য দেয় মাত্র। পূর্বের ন্যায় খালি গলায় অথবা এস্রাজ সহযোগে গানের ক্লাস না হলেও এখানে আজও তানপুরা এবং হারমোনিয়াম সহযোগে সুচারুভাবে, সযত্নে আগামী প্রজন্মকে রবীন্দ্রসংগীতের দীক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে।

রবীন্দ্রসংগীতে যন্ত্রানুষঙ্গের প্রসঙ্গের সমান্তরাল আরো একটি বিষয় খুব স্বাভাবিকভাবে উঠে আসে, সেটি হল রবীন্দ্রসংগীতের আবহসংগীত। রবীন্দ্রগানের আদিযুগে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির ১১ই মাঘের সংগীতানুষ্ঠানের দিকে ফিরে তাকালে দেখা যায় যে, সেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচালনায় সরলা দেবী, প্রতিভা দেবীরা যে রবীন্দ্রগানগুলি গাইতেন, সেই গানগুলি ধরবার পূর্বে গানগুলি যেই রাগ-রাগিণীকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে, সেই রাগালাপ 'মিলিতযন্ত্রে' খানিকক্ষণ বাজাবার পর তাঁরা গান শুরু করতেন।[9] অর্থাৎ, দেখা যাচ্ছে যে, তাঁর গানে আবহ সংগীত প্রয়োগ নিয়েও তাঁর বিন্দুমাত্র সংকীর্ণতা ছিলনা। তিনি শুধুমাত্র চাইতেন যে, বাদ্যযন্ত্রের বাহুল্য যেন কখনো গানকে ছাপিয়ে না যায়।

লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্যক্তিগতভাবে বরাবর একঢালা অর্থাৎ একটানা গান গাইতেই পছন্দ করতেন। তাঁর নিজস্ব রেকর্ড করা গানগুলিতে অথবা তাঁর পরিচালনায়, তাঁর কাছে প্রত্যক্ষভাবে যাঁরা গান শিখে গান রেকর্ড করেছেন, যেমন – দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহানা দেবী, অমিতা সেন, অমিয়া ঠাকুর, রমা মজুমদার – প্রমুখের ক্ষেত্রেও কোনোরকম আবহসংগীত বা আলাদা সুরের কাঠামো লক্ষ্য করা যায়না। অর্থাৎ, তাঁরাও নিরবিচ্ছিন্নভাবে সম্পূর্ণ গানটি রেকর্ড করেছেন। এক্ষেত্রে, সেকালের রেকর্ডের নির্ধারিত সময়সীমা একটা কারণ বলে মনে করা যেতেই পারে। তখনকার দিনে প্রযুক্তিগত কারণে একটা নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যেই সম্পূর্ণ গানটি গাইতে হত, নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হলে আপনা-আপনিই রেকর্ডিং বন্ধ হয়ে যেত। এমতাবস্থায় গানের শুরুতে অথবা মাঝখানে আবহসংগীত প্রয়োগের কথা ভাবাটাই হয়তো বাতুলতা ছিল। আবার নিরবিচ্ছিন্নভাবে সম্পূর্ন গানটি গাইলে গানের অন্তর্নিহিত ভাবরসটি কোথাও কোনোভাবে ব্যাহত হয়না, গানের ভেতরকার ভাবরসে সম্পূর্ন ডুবে গিয়ে একটুও বাধাপ্রাপ্ত না হয়ে বিলীন হয়ে গান গাওয়া যায় – এই যুক্তিটিকেও সম্পূর্ন অগ্রাহ্য করা যায়না। তবে, রেকর্ডিং ছাড়াও সেইসময়কার বিভিন্ন অনুষ্ঠানগুলিতে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশনের ক্ষেত্রেও আবহসংগীতের ক্ষেত্রে গানের নিজস্ব সুর ব্যতীত অন্য কোনো সুরের কাঠামো খুব একটা লক্ষ্য করা যায়না। বড়জোর গান শুরুর আগে এবং গানের অন্তরা অংশ গাইবার পর সঞ্চারী অংশ গাইবার পূর্বে গানের প্রথম পংক্তিটি অথবা এমন কোনো অংশ, যেখান থেকে গানের স্থায়ী অংশটি সহজেই ধরা যাবে – এস্রাজে বা হারমোনিয়ামে বাজানো হত। এই রীতি শান্তিনিকেতন আশ্রম তথা সংগীতভবনে বহুবছর বলবৎ ছিল। পরিবর্তিত সময়, সংস্কৃতি এবং মানুষের রুচি পরিবর্তনের সাথে সাথে খুব সঙ্গত কারণেই এই রীতির বাত্যয় ঘটতে দেখা যায়। অধুনা সংগীত ভবনে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশনকালে গানটি মূলত: যেই রাগকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে, সেই রাগের আলাপ ছোটো করে এস্রাজে বাজাবার পর গান ধরা হয়, অন্তরা অংশ গাইবার পরও এই একই নিয়ম অনুসরণ করে সঞ্চারী অংশ গাওয়া হয়ে থাকে।

এই সমীক্ষায় দেখা গেল যে, রবীন্দ্রনাথের গানের আদিপর্বে তাঁর গানে তাঁর নিজেরই পরিচালনায় আবহসংগীত প্রয়োগ করা হত। তবে, শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর তাঁর নিজের গানে অথবা রবীন্দ্রসান্নিধ্যময় রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীদের গানে কোনোরকম আবহসংগীত প্রয়োগের তথ্য পাওয়া যায়না বললেই চলে। পরবর্তীকালের সংগীত ভবনে আবার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি পরিলক্ষিত। রবীন্দ্রসংগীতে বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োগই হোক অথবা তাঁর গানে আবহসংগীত প্রয়োগই হোক – পরিমিতি বোধ, সংযম, ব্যক্তিগত রুচি, নান্দনিক বোধ, ব্যক্তিগত প্রতিভা – এই বিষয়গুলির ওপরই একটি সুসামঞ্জস এবং যথাযথ পরিবেশনা নির্ভর করে।

[9] 'জীবনের ঝরাপাতা' - সরলা দেবী, পৃষ্ঠা- ৫৯

নৃপঞ্জী

- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। (১৩১৯)। *জীবনস্মৃতি ,* প্রকাশক - শ্রী নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, আদিব্রাহ্মসমাজ প্রেস্, ৫৫, আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। (বৈশাখ ১৩৭৩: ১৮৮৮ শক)। *সংগীত-চিন্তা ,* প্রকাশক - শ্রী নৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা - ৭
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। (আশ্বিন, ১৩৮৯)। *রবীন্দ্র-পরিচয় ,* প্রকাশক - শ্রী অশোক মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা - ১৭
- দেবী, মৃণালিনী। (২২শে শ্রাবণ, ১৩৮১)। *মৃণালিনী দেবী ,* প্রকাশক - কুমকুম ভট্টাচার্য, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা - ১৭
- ঠাকুর, রথীন্দ্রনাথ। (১৩ অগ্রহায়ণ ১৩৬৭)। *পিতৃস্মৃতি ,* প্রকাশক - শ্রী শ্রীশকুমার কুন্ড, ১৩৩ এ রাসবিহারী এভিনিউ , কলিকাতা - ২৯
- দেবী, মীরা। (১৩৭৬)। *স্মৃতিকথা ,* প্রকাশক - কুমকুম ভট্টাচার্য, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা - ১৭
- দেবী চৌধুরাণী, ইন্দিরা। (২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৭)। *রবীন্দ্রস্মৃতি ,* প্রকাশক - শ্রী জগদিন্দ্র ভৌমিক, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা - ১৭
- দেবী, সরলা। (আষাঢ়, ১৩৫৭)। *জীবনের ঝরাপাতা ,* প্রকাশক - ডি. মেহরা, রূপা এন্ড কোম্পানী, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট : কলকাতা ৭০০০১২
- দেবী, সাহানা। (নভেম্বর, ১৯৭৮)। *স্মৃতির খেয়া ,* প্রকাশক - উপমা সেনগুপ্ত, ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা - ৭০০০০৭
- দত্ত, হীরেন্দ্রনাথ। (আশ্বিন, ১৩৮৭)। *শান্তিনিকেতনের এক যুগ,* প্রকাশক - রণজিৎ রায়, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা - ১৭
- দাস, প্রফুল্লকুমার। (২৫শে বৈশাখ,১৩৭৯)। *রবীন্দ্রসংগীত - গবেষণা - গ্রন্থমালা ১ম খন্ড ,* প্রকাশক - শ্রী প্রভাস নিয়োগী, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা - ৭০০০২৬
- ঐ। (৯ই আশ্বিন, ১৩৮০)। *তদেব ২য় খন্ড,* প্রকাশক - শ্রী প্রভাস নিয়োগী, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা - ৭০০০২৬
- সেন, অমিতা। (১৩ই চৈত্র, ১৩৮৯)। *আনন্দ সর্বকাজে ,* প্রকাশক - শ্রীমতী প্রণতি মুখোপাধ্যায়, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, রবীন্দ্রচর্চাভবন, কালীঘাট পার্ক, কলকাতা - ৭০০০২৬
- সেন, সন্ধ্যা। (কার্তিক,১৩৮৬)। *সুরের আগুন , ১ম খন্ড,* প্রকাশক - সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, ৩১/১ বি মহাত্মা গান্ধি রোড, কলিকাতা -৭০০০০৯
- সেন, সন্ধ্যা। (ফাল্গুন, ১৩৮৮)। *সুরের আগুন , ২য় খন্ড,* প্রকাশক - সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, ৩১/১ বি মহাত্মা গান্ধি রোড, কলিকাতা -৭০০০০৯
- নাগ, কালিদাস। (২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৪)। *সুরের গুরু রবীন্দ্রনাথ,* প্রকাশক - শ্রী সুধাংশু বক্সী, সুমুদ্রণ, ১০ নং ঠাকুরদাস পালিত লেন, কলকাতা
- হালদার, অসিত কুমার। (১লা মাঘ, ১৩৬৫)। *রবিতীর্থে*, প্রকাশক - শ্রী মাধব চক্রবর্তী, অঞ্জনা প্রকাশনী, ১৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা - ১২
- বিশী, প্রমথনাথ। (আষাঢ়, ১৩৫১)। *রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন,* প্রকাশক - জগদিন্দ্র ভৌমিক, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা - ১৭
- বিশী, প্রমথনাথ। (ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৮)। *পুরানো সেই দিনের কথা,* প্রকাশক - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা - ৭৩
- দাস, সুধীরঞ্জন। (আশ্বিন, ১৩৬৬)। *আমাদের শান্তিনিকেতন,* প্রকাশক - কুমকুম ভট্টাচার্য, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা - ১৭
- মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার। (১৩৬৯)। *শান্তিনিকেতন - বিশ্বভারতী,* প্রকাশক - শ্রী রামকুমার মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা - ১৭
- মুখোপাধ্যায়, প্রণতি। (১লা জানুয়ারী, ১৯৮৫)। *দিনেন্দ্র শতবার্ষিকী গ্রন্থ,* প্রকাশক - সুশান্ত নাগ, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কালীঘাট পার্ক, কলকাতা - ৭০০০২৬

- ঘোষ, শান্তিদেব। (২২শে শ্রাবণ, ১৪০৩)। *জীবনের ধ্রুবতারা,* প্রকাশক - সুবীরকুমার মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা - ৭০০০০৯
- ঘোষ, শান্তিদেব। (অগাস্ট ,১৯৭৮)। *রবীন্দ্রসংগীত বিচিত্রা,* প্রকাশক - ফণিভূষণ দেব, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা - ৭০০০০৯
- ঘোষ, শান্তিদেব। (৭ই পৌষ, ১৩৪৯)। *রবীন্দ্রসংগীত ,* প্রকাশক - রণজিৎ রায়, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা - ১৭
- মজুমদার, শৈলজারঞ্জন। (ডিসেম্বর,১৯৮৫)। *যাত্রাপথের আনন্দগান,* প্রকাশক - সুবীরকুমার মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা - ৭০০০০৯
- মজুমদার, শৈলজারঞ্জন। (অক্টোবর, ১৯৮৯)। *রবীন্দ্রসংগীত চিন্তা,* প্রকাশক - পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসংগীত আকাদেমি, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
- দে, কিরণশশী। (বৈশাখ, ১৩৮০)। *রবীন্দ্রসঙ্গীত সুষমা,* প্রকাশক - সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা - ৭০০০৭৩
- রায়, আলপনা। (২০ ডিসেম্বর, ২০০১)। *রবীন্দ্রনাথের গান - সঙ্গ-অনুষঙ্গ,* প্রকাশক - প্যাপিরাস, অরিজিৎ কুমার, ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন, কলকাতা - ৭০০০০৪
- রায়, আলপনা। (মে, ২০০১)। *ঐ আসন তলে,* প্রকাশক - সন্দীপ বসু সর্বাধিকারী, সপ্তক, 'অনামী', রতনপল্লি, শান্তিনিকেতন - ৭৩১২৩৫
- বিশ্বাস, দেবব্রত। (ভাদ্র,১৩৮৫)। *ব্রাত্যজনের রুদ্ধসংগীত,* প্রকাশক - বামাচরণ মুখোপাধ্যায়, করুণা প্রকাশনী, ১৮এ, টেমার লেন, কলকাতা - ৯
- বোস, নিমাইসাধন। (অগাস্ট, ১৯৮৮)। *Viswabharati Annals On Music,* প্রকাশক - সুব্রত চক্রবর্তী, বিশ্বভারতী রিসার্চ পাবলিকেশন্স, শান্তিনিকেতন - ৭৩১২৩৫
- বন্দ্যোপাধ্যায় কণিকা ও বন্দ্যোপাধ্যায় বীরেন্দ্র। (আশ্বিন, ১৩৮২)। *রবীন্দ্রসংগীত : কাব্য ও সুর,* প্রকাশক - বামাচরণ মুখোপাধ্যায়, করুণা প্রকাশনী, ১৮ এ, টেমার লেন, কলকাতা - ৯
- ভট্টাচার্য, স্বপন কুমার। (১লা মার্চ, ২০১৪)। *শান্তিনিকেতনে সংগীতচর্চা : রবীন্দ্র-অনুষঙ্গে কয়েকজন সংগীতগুণী ও অন্যান্য,* প্রকাশক - শ্রী ব্রজগোপাল মাইতি, ৩০, বিধান সরণি, কলকাতা - ৭০০০০৬

পত্রিকাপঞ্জী

- 'দেশ'- পত্রিকা, সাহিত্যসংখ্যা - ১৩৮০, সম্পাদক - শ্রী অশোককুমার সরকার
- শান্তিনিকেতন পত্রিকা, আষাঢ়, ১৩২৬ বঙ্গাব্দ, তৃতীয় সংখ্যা, প্রকাশকাল - ১৮ই আষাঢ়,সম্পাদক, মুদ্রক, প্রকাশক - জগদানন্দ রায়, শান্তিনিকেতন প্রেস, পোস্ট - শান্তিনিকেতন, জিলা - বীরভূম

পত্রপঞ্জী

- রবীন্দ্রভবন আর্কাইভ থেকে প্রাপ্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা পত্রাংশ - (CFB - 289100000047-00000048)